بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ১৫ নবুয়্যত, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রেক্ষাপটে আলোচনা শুরু করব। হুদাইবিয়ার সন্ধি ষষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মোতাবেক ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ (মাসে) সংঘটিত হয়েছিল। একে হুদাইবিয়ার যুদ্ধাভিযানও বলা হয়। হুদাইবিয়ার যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা একটি সম্পূর্ণ সূরা, অর্থাৎ সূরা ফাতহ্ অবতীর্ণ করেছেন, যার সূচনা হয়েছে এই আশিসময় আয়াত দ্বারা; আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا

অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তোমার ভূত-ভবিষ্যতের সকল ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন আর তোমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহরাজি পূর্ণ করেন এবং (তোমাকে) সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ্ তোমাকে সেই সাহায্য করুন যা সম্মান ও বিজয়ের সাহায্য। **(সূরা আল-ফাতহ্: ২-৪)**

গযওয়ায়ে হুদাইবিয়াকে কেন হুদাইবিয়ার যুদ্ধাভিযান বলা হয় এবং এর পরিচিতি কী– তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। হুদাইবিয়া একটি কূপের নাম ছিল, যে কারণে এই স্থানটির নাম হুদাইবিয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের সূচনালগ্নে এই কূপটি পথিক এবং হাজীদের প্রয়োজনে কাজে আসতো, কিন্তু (সেখানে) কোনো বসতি ছিল না। হুদাইবিয়া মক্কা থেকে ১ মারহালা অর্থাৎ নয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর মক্কা থেকে মদীনার দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। এভাবে মদীনা থেকে হুদাইবিয়ার দূরত্ব প্রায় ২৪১ মাইলে দাঁড়ায়। হুদাইবিয়া মক্কার হেরেমের পশ্চিম প্রান্ত এবং কারো কারো মতে এর অধিকাংশ অংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু অংশ হেরেমের বাইরে অবস্থিত। হুদাইবিয়ার এই স্থানটিতেই মুসলমান এবং কুরাইশের মাঝে চুক্তি হয়েছিল যেটিকে হুদাইবিয়ার সন্ধি বলা হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে একে হুদাইবিয়ার যুদ্ধও বলা হয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে এটিকে তিহামার যুদ্ধও বলা হয়েছে। মক্কা এবং এর আশেপাশের এলাকাকে প্রচণ্ড গরম এবং মরুঝড়ের কারণে তিহামা বলা হতো। এ কারণে এটি **তিহামা** নামে পরিচিতি লাভ করে। এর কারণ কী ছিল? বিভিন্ন রেওয়ায়েত এবং ইতিহাস থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে হুদাইবিয়া সফর করেছিলেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় নিজেদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল কেটে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং তিনি (সা.) বায়তুল্লাহ্‌তে প্রবেশ করেছেন এবং এর চাবি গ্রহণ করেছেন। আর আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকারীদের সাথে অবস্থান করেছেন। অর্থাৎ সেখানে অবস্থান করেন। তখন মহানবী (সা.) আরবের অধিবাসী এবং আশেপাশের

বেদুইনদের ডাকেন যেন তারা সবাই তাঁর (সা.) সাথে যাত্রা করে। এই সফরে মুসলমানদের কাছে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না আর তা-ও ছিল খাপবদ্ধ। অর্থাৎ তরবারি খাপের ভেতরে ছিল। সে-যুগে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় প্রত্যেকেই নিজের সাথে তরবারি রাখতো। তাই এটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে, যার কাছে তরবারি রয়েছে সে অবশ্যই যুদ্ধ করবে। হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য কোনো আশঙ্কা অনুভব করেন তাহলে আপনি কেন যুদ্ধের জন্য সাজসরঞ্জাম সাথে নিচ্ছেন না? তিনি (সা.) বলেন, যেহেতু আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি তাই নিজের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেতে চাই না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ‘সীরাত খাতামান নবীঈন’ পুস্তকে মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের উল্লেখ করতে গিয়ে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সা.) এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর সাহাবীদের আহ্বান জানান, তারা যেন উমরার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। উমরা হলো এক প্রকার ছোটো হজ্জ, যাতে হজ্জের কিছু অবশ্য করণীয় বাদ রেখে কেবল বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ এবং (পশু) কুরবানী করা হয়। আর হজ্জের বিপরীতে এর জন্য বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ও নির্ধারিত ছিল না, বরং এই ইবাদত যে-কোনো মৌসুমে পালন করা যায়। এ উপলক্ষ্যে মহানবী (সা.) সাহাবীদের মাঝে এই ঘোষণাও করেন যে, এই সফরে যেহেতু কোনো প্রকার যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধুমাত্র এক শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় ইবাদত সম্পাদন করা হলো মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই মুসলমানদের উচিত এই সফরে যেন নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র সাথে না নেয়; বরং আরবের ঐতিহ্য অনুযায়ী কেবল নিজেদের তরবারিকে খাপবদ্ধ করে পথিকের ন্যায় নিজের সাথে রাখা যেতে পারে।

হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কত ছিল? এ বিষয়েও মতভেদ পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েতে আছে, এক হাজারের কিছু বেশি সাহাবী ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে এক হাজার তিনশ উল্লেখ হয়েছে। আরেক বর্ণনায় আছে, এক হাজার চারশ (সাহাবী) ছিলেন। মোটকথা, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে সতেরোশ পর্যন্ত সংখ্যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক হাজার থেকে নিয়ে সতেরোশ পর্যন্ত বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। যাত্রার সময় হলে কুরবানীর পশুগুলোকে হযরত নাজিয়া বিন জুনদুব আসলামী (রা.)-র হাতে সোপর্দ করা হয়, যিনি সেগুলোকে যুল-হুলাইফায় নিয়ে যান। যুল-হুলাইফাও মদীনা থেকে ছয় বা সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি জায়গা। যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মদীনায় সর্বদা তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করতেন। ইবনে সা’দের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) মদীনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। যদিও ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নুমায়লা বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়। আর বালাযুরী, হযরত আবু রুহম কুলসুম বিন হুসাইন (রা)-র কথা উল্লেখ করেছেন। আবার কারো কারো মতে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন এবং বাকি সবাইকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের সফরের প্রস্তুতি এবং যাত্রার বিশদ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) (যাত্রার) এই ঘোষণা দেবার পর তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে গোসল করেন এবং **সুহারের** তৈরি দুটি কাপড় পরিধান করেন। সুহার ইয়েমেনের একটি বসতি এবং এই (এলাকার) কাপড় উন্নত মানের হতো। এরপর তিনি (সা.) বাইরে আসেন

এবং দরজার কাছে থাকা তাঁর উটনী কাসওয়া'র ওপর আরোহণ করেন। এই সফরে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত উম্মে সালামা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) যিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন যাত্রা আরম্ভ করেন আর যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে সেখানে যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর কুরবানীর পশুগুলো নিয়ে আসতে বলেন যেগুলোর সংখ্যা ছিল সত্তর, এরপর সেগুলোর গলায় মালা পরান। এরপর তিনি (সা.) কিছু উটকে চিহ্নিত করেন, অর্থাৎ সেগুলোর কুঁজে চিহ্ন লাগান যেন বুঝা যায় যে, এগুলো কুরবানীর উট। এরপর তিনি (সা.) হযরত নাজিয়া বিন জুনদুব (রা.)-কে নির্দেশ দিলে তিনি অবশিষ্ট পশুগুলোকে চিহ্নিত করেন; (অর্থাৎ) সেগুলোকেও চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলোর গলায় মালা পরানো হয়। অন্যান্য মুসলমানরাও নিজেদের পশুগুলোর গলায় মালা পরান এবং চিহ্নিত করেন। এই সফরে মুসলমানদের কাছে দুইশ ঘোড়া ছিল।

মহানবী (সা.)-এর ইহরাম বাঁধা সম্পর্কে এরূপ বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) দুরাকাত নামায পড়েন এবং যুল-হুলায়ফার মসজিদের দরজা থেকে (বাহনে) আরোহণ করেন। তিনি (সা.) উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন যেন লোকেরা বুঝতে পারে, তিনি (সা.) বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারত এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। এরপর তিনি (সা.) এই তালবিয়াহ্ পাঠ করেন-

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ. لَا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থাৎ, **'আমি উপস্থিত। হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, তোমার কোনো শরীক বা অংশীদার নাই। আমি উপস্থিত। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ তোমারই এবং রাজত্ব তোমারই। তোমার কোনো অংশীদার নাই'**। মহানবী (সা.) কুরাইশের গতিবিধি জানার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ তারা কোনো দুষ্কৃতি করার দুরভিসন্ধি করছে কি না– (তা জানার জন্য) একজন সংবাদ সংগ্রাহক **হযরত বুসর বিন সুফিয়ান** (রা.)-কে অগ্রে প্রেরণ করেন আর অতিরিক্ত সতকর্তাবশতঃ তিনি **হযরত আব্বাদ বিন বিশর** (রা.)-কে, আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী **হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশহালী** (রা.)-কে বিশজন অশ্বারোহীর নেতা মনোনীত করে অগ্রে প্রেরণ করেন। বিভিন্ন স্থানে যাত্রাবিরতি দিয়ে যখন মহানবী (সা.) রওহা নামক স্থানে পৌঁছেন যা মদীনা থেকে ৭৩ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত, তখন তিনি জানতে পারেন, লোহিত সাগরের তীরবর্তী **গায়কা উপত্যকায়** কিছু মুশরিক বা পৌত্তলিক রয়েছে আর তাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ হবার আশঙ্কা রয়েছে। তখন তিনি (সা.) **হযরত আবু কাতাদা আনসারী** (রা.)-র নেতৃত্বে, যিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন নি, সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন।

এই সফরে কিছু মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সফরকালে একস্থানে লোকেরা মহানবী (সা.)-এর পাশে সমবেত হন, যখন তাঁর সামনে পানির একটি পাত্র ছিল আর তিনি তা দিয়ে ওযু করছিলেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? সাহাবীরা নিবেদন করেন, আপনার কাছে এ পাত্রে যে পানি আছে সেটি ছাড়া আমাদের কারো কাছে পান করার বা ওযু করার জন্য আর কোনো পানি (অবশিষ্ট) নাই। একথা শুনে মহানবী (সা.) সেই পাত্রে নিজের হাত রাখেন। সে সময় তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে এমনভাবে পানির ফোয়ারা বইতে আরম্ভ করে, যেন পানির ঝরনাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। **হযরত জাবের** (রা.) বলেন, আমরা সবাই পানি পান করি এবং ওযু করি। যদি আমরা সংখ্যায় এক লক্ষও হতাম

তথাপি সেই পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো, অথচ তখন আমাদের সংখ্যা ছিল কেবলমাত্র পনেরোশ।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ইতিহাসের গ্রন্থাবলির আলোকে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালে এমন এক সময় আসে যখন মহানবী (সা.)-এর ব্যবহৃত ঘটিটি ছাড়া সকল ঘটিবাটি পানিশূন্য হয়ে যায়। এ সময় সাহাবীদের পক্ষ থেকে পানি (শেষ হওয়ার) অনুযোগ শুনে মহানবী (সা.) তাঁর ঘটির মুখের ওপর নিজের পবিত্র হাত রাখেন এবং ঘটির মুখ নিচু করে সাহাবীদের বলেন, এখন তোমরা নিজেদের পাত্র নিয়ে আসো এবং (পানি) ভরে নাও। বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় তাঁর আঙ্গুলের ভেতর থেকে এমনভাবে পানির ধারা বইছিল যেন একটি ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি সবাই নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সংগ্রহ করেন এবং মুসলমানদের কষ্ট দূর হতে থাকে।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, **“খোদা তা’লার সাথে ‘লিকা’ তথা সাক্ষাতের মানে উপনীত হবার কল্যাণে অনেক সময় মানুষের দ্বারা এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয় যা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে বলে প্রতীয়মান হয় এবং ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে ধারণ করে। এমন অনেক মু’জিযা তথা অলৌকিক নিদর্শন রয়েছে যা মহানবী (সা.) কেবলমাত্র ব্যক্তিগত শক্তিতে বা নৈপুণ্যে প্রদর্শন করেছেন, যার মাঝে (বাহ্যত) দোয়ার কোনো হাত ছিল না। অনেক সময় একটি পাত্রে রাখা সামান্য পরিমাণ পানির মধ্যে নিজের আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে তা এত পরিমাণে বাড়িয়ে দেন যে, সকল সেনা, উট এবং ঘোড়া সেই পানি পান করার পরও সেই পানি আগের পরিমাণেই বিদ্যমান থাকে। আবার অনেক সময় দু-চারটি রুটির ওপরে হাত রাখার ফলে তা দ্বারা সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তের উদরপূর্তি হয়ে যায়। আবার কখনো সামান্য দুধকে তাঁর পবিত্র ঠোঁটের স্পর্শে বরকতমণ্ডিত করে তা দ্বারা একটি গোটা দলের পেট ভরে দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো সময় লবণাক্ত পানির কূপে তাঁর পবিত্র মুখের লালা ফেলে সেই পানি একেবারে সুমিষ্ট করে দিয়েছেন। আর কখনো কখনো গুরুতর আহতদেরকে নিজের হাতের স্পর্শে সুস্থ করে দিয়েছেন। আবার কখনো যুদ্ধের কোনো আঘাতের কারণে বাইরে বের হয়ে আসা চোখের অক্ষিগোলককে নিজের হাতের কল্যাণে আবার ঠিক করে দিয়েছেন। এরূপ আরও অনেক কাজ নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় করেছেন যার পেছনে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি সম্পৃক্ত ছিল।”**

মহানবী (সা.)-এর মু’জিযা তথা অলৌকিক নিদর্শনাবলি প্রসঙ্গে তিনি (আ.) এসব কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা.)-এর সফরের সংবাদ পাওয়ামাত্রই কুরাইশের সেনাবহিনী প্রস্তুত করার এবং সাহাবীদের সাথে মহানবী (সা.)-এর পরামর্শ করার উল্লেখও পাওয়া যায়। কুরাইশরা এ বিষয়টি জানা সত্ত্বেও যে, মুসলমানরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহ্ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসছে– মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রত্যেক তরবারি ধারণে সক্ষম ব্যক্তি মুসলমানদেরকে প্রতিহত করার জন্য বের হয়ে আসে; এটি জানা সত্ত্বেও যে, (মুসলমানরা) যুদ্ধের জন্য আসছে না; আর নিজেদের মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে আট হাজার সৈন্য (সম্বলিত) সেনাদল গঠন করে মক্কার পশ্চিম প্রান্তে **বালদাহ্ নামক উপত্যকায়** শিবির স্থাপন করে এবং খালিদ বিন ওয়ালীদকে দু–শো অশ্বারোহীসহ মহানবী (সা.) এবং সাহাবীদের পথরোধ করার জন্য **উসফান** থেকে আট মাইল দূরত্বে **কুরাউল গামীম নামক উপত্যকায়** প্রেরণ করে। **হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা** এবং **মারওয়ান বিন হাকাম** (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উসফানের নিকটবর্তী (এলাকা) **আশতাতের জলাধারে** পৌঁছামাত্রই তাঁর সংবাদ সংগ্রহকারী বা অনুসন্ধানী তাঁর

কাছে আসে। সে বলে, **কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক বড়ো সেনাদল জড়ো করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্রকে সমবেত করেছে আর তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং আপনাকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে প্রবেশে বাধা প্রদান করবে**। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমাকে পরামর্শ দাও। **তোমরা কি মনে করো যে, যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতে বাধা দিতে চায়, আমি তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানসন্ততি সবার ওপর আক্রমণ করি? আর তারা যদি আমাদের দিকে আসে তাহলে আমরা তাদেরকে পরাজিত করে ছাড়ি?** হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। আপনি কাউকে হত্যা করার সংকল্প করেন নি কিংবা কারো সাথে যুদ্ধ করার সংকল্পও করেন নি। এজন্য আপনি সেই গৃহ অভিমুখে চলুন। আর যারা আমাদেরকে একাজে বাধা দেবে আমরা তাদের সাথে লড়াই করব**। (অর্থাৎ, আমাদের উচিত নিজেদের কাজ করতে থাকা; সফর অব্যাহত রাখা উচিত।) **হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের** (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-র একথায় সহমত পোষণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-র পর হযরত মিকদাদ (রা.) নিবেদন করেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা আপনাকে সেই কথা বলবো না যা বনী ইসরাঈল তাদের নবী হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল, 'তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বসে থাকবো'। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি চলুন, আপনি এবং আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন এবং আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ করব।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'মক্কাবাসীরা (মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে) অবগত হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তারা মুসলমানদেরকে বলে, তোমাদেরকে এখানে আসার অনুমতি কে দিয়েছে? তারা বলে, আমরা যুদ্ধ করতে আসি নি, শুধুমাত্র উমরা করতে এসেছি। এই স্থান তোমাদের কাছেও বরকতমণ্ডিত এবং আমাদের নিকটও। আমরা এর যিয়ারত করতে এসেছি, যুদ্ধ করতে নয়। তারা বলে, তওয়াফের তো প্রশ্নই ওঠে না। (কাফিররা প্রত্যাখ্যান করে।) তোমাদের ও আমাদের মাঝে যুদ্ধ চলছে, যদি তোমরা মক্কায় প্রবেশ করো এবং তওয়াফ করে ফেরত যাও, তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের নাক কাটা যাবে বা অসম্মান হবে। অর্থাৎ, তোমাদের শত্রুরা এসে তোমাদের গৃহ তওয়াফ করে গেছে! আমরা পুরো আরব বিশ্বকে অনুমতি দিতে পারি কিন্তু তোমাদেরকে দিতে পারব না।

যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, খালিদ বিন ওয়ালীদ দুইশ সৈন্যসহ মহানবী (সা.)-এর কাফেলাকে প্রতিহত করার জন্য এবং মহানবী (সা.)-এর পথ রোধ করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়। যখন মহানবী (সা.) জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) খালিদ বিন ওয়ালীদের পথ থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন পথ ধরে হুদাইবিয়ায় পৌঁছেন। যার বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

কয়েক দিনের পথ পাড়ি দিয়ে যখন তিনি (সা.) উসফান নামক স্থানে পৌঁছেন, যেটি মক্কা থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত; তখন তাঁর (সা.) সংবাদ-সংগ্রাহক ফেরত এসে তাঁর (সা.) সমীপে সংবাদ দেয় যে, মক্কার কুরাইশরা ভীষণ উত্তেজিত এবং তারা তাঁকে প্রতিহত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এমনকি তাদের কয়েকজন নিজেদের উত্তেজনা ও হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশের জন্য চিতাবাঘের চামড়া পরিধান করে আছে। আর যে–কোনো মূল্যে মুসলমানদের প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের দৃঢ় সংকল্প করেছে। এটিও জানা গেছে, কুরাইশরা নিজেদের কতিপয় দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীর একটি সৈন্যদলকে খালিদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে অগ্রে

প্রেরণ করেছে, (যিনি তখনো মুসলমান হন নি।) আর এই সেনাদলটি বর্তমানে মুসলমানদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর এই সেনাদলে ইকরামা বিন আবু জাহল প্রমুখও রয়েছে। মহানবী (সা.) এই সংবাদ পেয়ে সাহাবীদেরকে মক্কার সুপরিচিত পথ ছেড়ে ডানদিক দিয়ে অগ্রসর হতে নির্দেশ প্রদান করেন, যেন সংঘর্ষ এড়ানো যায়। তাই মুসলমানরা সমুদ্র দিক দিয়ে একটি দুর্গম ও কঠিন পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবী (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধ হোক তা পছন্দ করছিলেন না, কেননা তিনি যুদ্ধের জন্য নয় বরং উমরার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন।

যাহোক, তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে যান। মুসলমানদের রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য দিক দিয়ে চলে যাবার সংবাদ খালিদ বিন ওয়ালীদ ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। এমনকি খালিদ বিন ওয়ালীদ যখন ইসলামী সেনাদলের (ছুটে আসার উড়ন্ত) ধুলো দেখতে পায় তখন কুরাইশকে সতর্ক করার জন্য ছুটতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর হুদাইবিয়াতে আগমন করার বিষয়ে রেওয়ায়েতে এসেছে, **হযরত মিসওয়ার বিন মাখযামা (রা.)** এবং **মারওয়ান** (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হুদাইবিয়ার প্রান্তরে পৌঁছে যান; এমনকি যখন তিনি (সা.) সেই গিরিপথে পৌঁছেন যেখান থেকে কুরাইশের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, (তখন) তাঁর (সা.) উট তাঁকে নিয়ে বসে পড়ে। লোকজন সেটিকে দাঁড় করানোর জন্য হাঁকডাক দিলেও সেটি একইভাবে বসে থাকে। লোকেরা বলে, কাসওয়া বেঁকে বসেছে। মহানবী (সা.) বলেন, কাসওয়া বেঁকে বসে নি আর এটি তার স্বভাবও নয়, বরং হস্তিবাহিনীকে প্রতিহতকারী পবিত্র সত্তা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা একে থামিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরাইশরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে যা-ই দাবি করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তা দেবো। এরপর তিনি (সা.) উটনীকে ধমক দিলে সেটি উঠে দাঁড়ায়। তিনি বলেন, কুরাইশরা যা-ই দাবি করবে, তাতে যদি আল্লাহ্র মর্যাদায় আঁচড় না লাগে তাহলে আমি তাদের দাবি পূরণ করব। যাহোক, তিনি হাঁক দিলে উটনী পুনরায় চলতে আরম্ভ করে। তিনি (সা.) মক্কাবাসীদের দিক থেকে সরে যান এমনকি হুদাইবিয়ার অপর প্রান্তে স্বল্প পানির একটি জলাধারের নিকটে শিবির স্থাপন করেন। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন.

এখানে তাঁর উটনী দাঁড়িয়ে যায় এবং সে সম্মুখে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার উটনী ক্লান্ত হয়ে গেছে তাই আপনি এর পরিবর্তে অন্য আরেকটি উটে আরোহণ করুন। কিন্তু তিনি (সা.) বলেন, না, না! এটি ক্লান্ত হয় নি; বরং মনে হচ্ছে এটিই আল্লাহ্র অভিপ্রায়, আমরা যেন এখানেই অবস্থান করি। আমি এখানে অবস্থান করে মক্কাবাসীদের কাছে সকল পদ্ধতিতে অনুরোধ করব, তারা যেন আমাদেরকে (উমরা) হজ্জ করার অনুমতি দেয়। আর (এজন্য) তারা যে শর্তই দিক না কেন– আমি তা মেনে নেব। ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার সেনাদল মক্কা হতে অনেক দূরত্বে অবস্থান করছিল এবং মুসলমানদের জন্য অপেক্ষায় ছিল। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) চাইলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি (সা.) যেহেতু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, প্রথমে তিনি মক্কাবাসীদের অনুমতিক্রমেই তওয়াফ করার চেষ্টা করবেন আর মক্কাবাসীরা স্বয়ং যুদ্ধ আরম্ভ করে যুদ্ধের জন্য বাধ্য করলেই কেবল তিনি যুদ্ধ করবেন, তাই মক্কার রাস্তা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন।

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুদাইবিয়াতে যে অল্প পানির ঝরনার কাছে মুসলমানরা অবস্থান গ্রহণ করেছিল, মানুষ তা হতে অল্প অল্প পানি নেওয়া আরম্ভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ সেটির পানি তুলে তা নিঃশেষ করে ফেলে আর মহানবী (সা.)-এর কাছে তারা তৃষ্ণার বিষয়ে অভিযোগ করে। হযরত নাজিয়া বিন আজম বর্ণনা করেন, হুদাইবিয়াতে মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন পানির ঘাটতির প্রচণ্ড অভিযোগ করা হয় তখন তিনি (সা.) আমাকে ডাকেন এবং নিজ তূণ হতে একটি তির বের করে আমাকে দেন। এরপর ঝরনার পানি একটি বালতিতে করে আনতে বলেন। আমি তা নিয়ে আসি। তিনি (সা.) তা দিয়ে ওযু করেন এবং কুলি করে সেই পানি বালতিতে ঢেলে দেন। এরপর তিনি (সা.) আমাকে বলেন, এই পানি সেই শুকিয়ে যাওয়া ঝরনায় ঢেলে দাও। আর সেই পানিতে তিরটি গেঁথে দাও। তখন আমি তা-ই করলাম। অতএব আমি সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, যিনি তাঁকে (সা.) সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি অনেক কষ্টে সেখান হতে বের হয়ে আসি। চতুর্দিক হতে পানি আমাকে ঘিরে ফেলে। পানি ঢেলে তির গেঁথে দেবার পর আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর তখনই কুয়ার ভেতর পানি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর পানি এমনভাবে টগবগ করছিল যেভাবে পাতিলে পানি ফুটে। এমনকি পানি ওপরে উঠে আসে এবং কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। মানুষ সেটির প্রান্ত হতে পানি ভরতে থাকে, এমনকি তাদের মধ্য হতে শেষ ব্যক্তিও নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করে নেয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই সময়ের একটি বৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বলেন, এটিও ইতিহাস গ্রন্থাবলি থেকে নেওয়া হয়েছে যে,

সেই রাতেই অথবা এর নিকটবর্তী সময়ে বৃষ্টিও বর্ষিত হয়। যখন ফজরের নামাযের জন্য মহানবী (সা.) আগমন করেন তখন পুরো ময়দান পানিতে পূর্ণ সিক্ত ছিল। মহানবী (সা.) হাস্যবদনে সাহাবীদের বলেন, তোমরা কি জানো, এই বৃষ্টির সময় তোমাদের খোদা কি বলেছেন? সাহাবীগণ রীতি অনুযায়ী বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমার বান্দাদের মাঝে কতক প্রকৃত ঈমানের সাথে এই সকাল করেছে। কিন্তু কতক কুফরের অবস্থায় পতিত হয়ে দোদুল্যমান হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি একথা বলেছে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্র আশিস ও দয়ায় এ বৃষ্টি হয়েছে, সে প্রকৃত ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে ব্যক্তি একথা বলেছে যে, এ বৃষ্টি অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবের কারণে হয়েছে– সেক্ষেত্রে সে নিঃসন্দেহে চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি যদিও বিশ্বাসী হয়েছে, কিন্তু সে আল্লাহ্র অস্বীকারকারী হয়েছে। এই নির্দেশের মাধ্যমে, যা তওহীদের সম্পদে পূর্ণ, মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে উপকরণ ও কার্যকারণের শৃঙ্খলের অধীনে আল্লাহ্ তা'লা এ জগৎ ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ নির্ধারণ করে রেখেছেন আর বৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহাকাশের বিভিন্ন বস্তুর প্রভাব অনস্বীকার্য; কিন্তু প্রকৃত তওহীদ হলো, মধ্যবর্তী উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মানুষের দৃষ্টি যেন সেই শত পর্দার আড়ালে থাকা সত্তার প্রতি উদাসীন না হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন কখনো উদাসীন না হয়। উপকরণ আল্লাহ্ তা'লাই প্রদান করেছেন আর তাঁর আদেশেই এসব উপকরণ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে– যিনি এই সমস্ত উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং এই জগৎ ব্যবস্থার সমস্ত কারণের মূল কারণ, আর তিনি ছাড়া এসব বাহ্যিক উপকরণ একটি মৃত পোকার চেয়ে অধিক মূল্য রাখে না।

মহানবী (সা.)-এর জন্য আমর বিন সালেম এবং বুসর বিন সুফিয়ান-এর উপহারেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। লিখিত আছে যে, আমর বিন সালেম এবং বুসর বিন সুফিয়ান, যারা

খুযাআ গোত্রের সদস্য ছিলেন, হুদাইবিয়ার সময় মহানবী (সা.)-কে ছাগল, উট প্রভৃতি উপহার দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কেও আমর বিন সালেম উট উপহার দিয়েছিলেন। হযরত সা'দ ছিলেন আমরের বন্ধু। হযরত সা'দ বিন উবাদা এই উপহার নিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং সংবাদ দেন যে, আমর তার জন্য উপহারস্বরূপ এই উট দিয়েছে। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমর আমাকেও উপহার দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমরের সম্পদে বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি নির্দেশ দেন, উটগুলো জবাই করে সেগুলো সাহাবীদের মাঝে বণ্টন করে দাও আর ছাগলগুলোকে সেভাবেই বণ্টন করে তাদেরকে দিয়ে দাও। আর এই বণ্টনে তিনি (সা.) নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর হযরত উম্মে সালামার কাছে উটের মাংস প্রেরণ করা হয় যা অন্যদের কাছেও প্রেরণ করা হয়েছিল। আর মহানবী (সা.) নিজের ছাগল থেকেও কিছু মাংস হযরত উম্মে সালামাকে প্রদান করেন এবং যে ব্যক্তি উপহার নিয়ে এসেছিল তাকে কাপড় উপহার প্রদান করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি (সা.) যে–সব উপহারসামগ্রী পেয়েছিলেন তা-ও একস্থানে একত্রিত করে সকল সাহাবীর মাঝে বণ্টন করে দেন।

এই বর্ণনা চলমান রয়েছে। হুদাইবিয়া সংক্রান্ত আরো কিছু বর্ণনা বাকি আছে। কীভাবে হয়েছে, কী হয়েছে– অবশিষ্ট বিষয়াদি আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াতের স্মৃতিচারণ করব এবং নামাযের পর জানাযা পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো স্নেহের শাহরিয়ার রাকিনের যে বাংলাদেশের মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের পুত্র ছিল।

এ ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, ৫ আগস্ট তারিখে সরকার পতনের পর; বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশে যে ভীষণ নৈরাজ্য ছিল তখন সরকার পতন হলে সারা দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে এবং আহমদীয়াতের বিরোধীরাও এটিকে কাজে লাগিয়ে আহমদনগর জামা'তের ওপর আক্রমণ করে বসে। এর পূর্বেও এখানে আক্রমণ হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যাচ্ছিল এবং মসজিদে আগুন লাগিয়ে জামেয়া ও জলসাগাহের দিকে যায়। তারা যদিও জামেয়াতে প্রবেশ করতে পারে নি, কিন্তু জলসাগাহের পেছন দিক থেকে এসে জলসাগাহের নিরাপত্তার জন্য সেখানে দায়িত্বরত খাদেমদের ঘিরে ফেলে এবং তাদেরকে মারতে থাকে। এরই মাঝে স্নেহের শাহরিয়ারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে, যার কারণে তিন মাস চিকিৎসার পর অবশেষে গত ৮ নভেম্বর ষোলো বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আর এভাবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে।

স্নেহের শাহরিয়ার ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য ছিল। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ছাড়া এক বোন আর দুই ভাই রয়েছে। মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে তার প্রপিতামহ হযরত মুন্সি সিরাজুল ইসলাম সাহেবের মাধ্যমে যিনি আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। মরহুম নিজেও জামা'তের একজন কর্মী ছিলেন। আহমদনগরে আতফালুল আহমদীয়ার আমেলায় সেক্রেটারি মাল হিসেবে সেবা করছিলেন।

তাঁর মা লেখেন, তার এই ছেলে শুরু থেকেই নামায ও ইবাদতে অনুরাগী এবং জামা'তী কাজে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। বরং তাকে যদি পড়ালেখার দোহাই দিয়ে জামা'তের কাজে পরে অংশ নেবার কথা বলা হতো তাহলে সে অসন্তুষ্ট হতো। আহমদনগরে

যখনই কোনো ইজতেমা বা জলসার উপলক্ষ্য আসত, তখন সে সবার আগে বাড়ি থেকে বের হয়ে সেখানে পৌঁছে যেত। তার মা বলেন, ঘরের ছোটো ছেলে হবার কারণে সে আমার কাজকর্মে খুব সাহায্য করত। রান্নাঘর এবং রান্নার কাজে খুব সহযোগিতা করত। এই ছেলেটি খুবই সামাজিক ছিল, যে-কোনো অপরিচিত ব্যক্তির সাথে খুব সহজে মিশে যেত। তাঁর মা আরো বলেন, সে-ও তার বড়ো ভাইয়ের মতো জামেয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার মা এটিও লিখেছেন যে, পূর্বেই তিনি এরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন যার মাধ্যমে স্নেহের শাহরিয়ারের শাহাদাত সম্পর্কে আগাম সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

খোদ্দামুল আহমদীয়া আহমদনগরের কায়েদ নাজমুস সাকিব সাহেব বলেন, এর পূর্বে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জলসার সময় হওয়া আক্রমণের ফলে ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হাসান সাহেব শহীদ হয়েছিলেন। (তখন) এখানে আমি তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়িয়েছিলাম আর খুতবায় তার স্মৃতিচারণও করেছিলাম। যাহোক, তিনি বলেন, আমরা সবাই ডিউটিতে নাস্তা করতে করতে খুতবা শুনছিলাম। তখন স্নেহের শাহরিয়ার রাকিন বলেন, আজ যদি আমি শহীদ হতাম তবে আমারও এরূপ স্মৃতিচারণ হতো! তিনি বিস্তারিত লিখতে গিয়ে বলেন, আক্রমণকারীরা যখন ৫ আগস্ট তারিখে হঠাৎ আক্রমণ করে, (অর্থাৎ এবার যে আক্রমণ হয়েছে অরাজকতার সময়,) তখন জামেয়া পাহারা দেবার জন্য বিপুল সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। আর রাস্তার অপর পাশে কেবল পনেরোজন খাদেম জলসাগাহের নিরাপত্তার দায়িত্বে দণ্ডায়মান ছিল। শাহরিয়ার তাদের সাথেই এসে যোগ দেয়। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পাহারা দিতে থাকে এবং প্রতিরক্ষা কাজে কায়েদ সাহেবকে সাহায্য করতে থাকে। হঠাৎ আক্রমণকারীরা গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঢোকার সাথে সাথেই তারা (দায়িত্বরতদের ওপর) চড়াও হয় আর লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রহার করতে থাকে। উপস্থিত লোকজনকে মারে এবং অনেককে আহত করে। এতে মরহুম সবচেয়ে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আর সেই সময় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁর সারা দেহ নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল যার বহিঃপ্রকাশ তিনি সেখানেই করেছিলেন। এরপর সেনাবাহিনীর গাড়ি আসে কিছুক্ষণ পর। আর সেনাবাহিনী এসে যাওয়ায় আক্রমণকারীরা আহত আহমদীদের ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

কায়েদ সাহেব আরও লেখেন, (মরহুম) যে-কোনো মুহূর্তে দায়িত্বপালন ও সেবা করতে প্রস্তুত থাকতেন। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও ওয়াকারে আমলে নিজেও অংশ নিতেন এবং অন্যদেরও সম্পৃক্ত করতেন। ফজর ও তাহাজ্জুদের নামাযে মানুষকে জাগানোর দায়িত্বও পালন করতেন।

বাংলাদেশ জামেয়ার শিক্ষার্থী জুহায়ের সাহেব বলেন, যেদিন তাঁর দাফন হচ্ছিল সেদিন জলসাগাহ এলাকায় আমার ডিউটি ছিল। আমি আহমদনগরের এক খাদেমকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে থাকতেন এবং খেলাধুলাও করেছেন। এমন কোন বিশেষত্ব ছিল যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে? তখন তিনি সে কথাই বলেন যে, ২০২৩ সালের জলসার সময় শহীদ হওয়া জাহিদ হাসানকে নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল এবং আমরা সবাই মিলে সেটি দেখছিলাম। তখন রাকিন হঠাৎ বলতে থাকে যে, ইশ! আমিও যদি জাহিদ ভাইয়ের মতো শহীদ হতে পারতাম, তবে আমার ছবিও এখানে থাকত এবং খুতবায় আমারও স্মৃতিচারণ হতো! তিনি বলেন, তাঁর একথা শুনে আমরা খুব অবাক হয়েছিলাম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

মরহুমের চাচী রিনাত ফৌযিয়া বলেন, ভাইদের মধ্যে সে সবার ছোটো ছিল এবং সবার কথা মান্য করত। সবার কাজ করে দিত। আর আক্রমণের দিন বাড়ি থেকে যখন বের হচ্ছিল তখন বলছিল, মসজিদের সুরক্ষা করতে হবে; যদি সফল হতে না পারি তাহলে শহীদ হয়ে যাব। মোটকথা শহীদ মরহুম বড়োদের জন্যও কুরবানীর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা পড়াবো আমাদের এক পুরনো আরব বন্ধু কাবাবীরের অধিবাসী আব্দুল্লাহ্ আসাদ ওদেহ সাহেবের, যিনি কিছুদিন পূর্বে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

এমন পরিবারে তিনি লালিতপালিত হয়েছেন যে পরিবার কাবাবীরের আহমদী মুবাল্লেগদের সাথে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক রাখতো। সে সকল মুবাল্লেগদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং দোয়া আর এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র দোয়ার ফলে কাবাবীর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সুরক্ষায় এবং নিরাপদ থেকেছে। বিশেষত ফিলিস্তিনের যুদ্ধ এবং ১৯৪৮ সালে বড়ো পরিসরে অবস্থান পরিবর্তনের সময় আল্লাহ্ তা'লা কাবাবীরকে সুরক্ষিত রেখেছেন। মরহুম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র যুগ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের খলীফাদের সাথে চিঠিপত্র আদান-প্রদান আর আনুগত্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ গভীর সম্পর্ক রেখেছেন। প্রারম্ভিক মূসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে হযরত মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব আহমদীয়া স্কুল চালু করলে সেখানে মরহুম প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর আল-কুদ্স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তম ফলাফলসহ এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ বছর যাবৎ শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন। এরপর রাষ্ট্রীয় অডিট বিভাগে এক বড়ো পদে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৫ সালে সেখান থেকে অবসরে যান। অবসর গ্রহণের পর ধর্ম মন্ত্রণালয়ে ইসলাম বিষয়ক প্রধান হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি আহমদী হওয়ার কারণে কতিপয় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ তার বিরোধিতা করে। তখন তিনি নিজ নীতি ও আদর্শ এবং আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তা থেকে হাত গুটিয়ে নেন।

১৯৪৫ সালে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব জাতিসংঘের প্রতিনিধি হিসেবে ফিলিস্তিন সফর করেন এবং সেই সফরে তিনি মিশন হাউজেও আসেন আর মরহুম আবু সালাহ মুহাম্মদ সালেহ ওদেহ, যিনি শরীফ ওদেহ-র দাদা ছিলেন, তার বাড়িতে অবস্থান করেন। সে সময় মরহুম আব্দুল্লাহ্ আসাদ সাহেব ১৫ বছরের যুবক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন চৌধুরী সাহেবের সেবার নিমিত্তে আসতেন এবং তাকে পত্রপত্রিকা ইত্যাদিও সরবরাহ করতেন।

মরহুম সর্বদা মুবাল্লেগদের একান্ত সান্নিধ্যে থেকেছেন এবং জেনারেল সেক্রেটারি, সেক্রেটারি তা'লীম ও তরবিয়্যত, সেক্রেটারি উমুরে খারেজা, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং শতবর্ষ জুবিলি উদ্‌যাপন কমিটির সেক্রেটারি পদে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কাবাবীরে নব-নির্মিত মাদরাসায়ে আহমদীয়ার মহান কর্মযজ্ঞে মুবাল্লেগ সিলসিলাহ জনাব জালালুদ্দীন কমর সাহেব মরহুমের সহায়ক ও সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি উচ্চমার্গের

একজন লেখক ছিলেন। আরবী পত্রিকা ‘আল-বুশরা’তে সত্তর বছর পর্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি সূরা কাহাফের তফসীর ইংরেজী থেকে আরবীতে অনুবাদও করেছেন যেটি মুবাল্লেগ সিলসিলাহ মুকাররম ফযলে ইলাহী বশীর সাহেবের যুগে জামা'তে মুদ্রিত হয়েছে।

আরব দেশসমূহে জামা'ত বিরোধী অপপ্রচার চলছিল যে, জামা'তে আহমদীয়া এবং বাহাইয়্যাত একই মুদ্রার দুপিঠ। [এতে জামা'তকে বাহাইদের সাথে মেলানো হয়েছে।] আব্দুল্লাহ্ আসাদ সাহেব এর দাঁতভাঙা জবাব দিতে গিয়ে আরবী ভাষায় “আল-মুআমেরাতুল কুবরা” শিরোনামে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। অনুরূপভাবে তিনি আহমদীয়া জামা'ত, কাবাবীরের ইতিহাস বিষয়ে **‘আল কাবাবীর বালাদী’** অর্থাৎ ‘আমার শহর কাবাবীর’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, আত্মাভিমানী, আহমদীয়াত ও জামা'ত সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়ে গর্বিত জামা'তের একজন প্রকৃত সেবক। তিনি সংসদ সদস্য হওয়ার প্রস্তাবও লাভ করেন, কিন্তু তিনি তা এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি নীতিমালা থাকে, কিন্তু আমার নীতি হলো– আহমদীয়াত। মরহুমের ছেলে খালেদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, কখনো কখনো আমার বাবা জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকলে আমার মা একসাথে চা পান করতে অথবা বাইরে যেতে বললে তিনি জবাবে বলতেন, আমার কাছে জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে; সেটি শেষ করেই অন্য কাজে মন দেবো। জামা'তের দায়িত্ব সর্বাগ্রে। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে, তিন মেয়ে এবং চৌদ্দজন পৌত্র-পৌত্রি রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। তাঁর মর্যাদা উন্নত করুন এবং তার পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁর পদাঙ্কে পরিচালিত হবার তৌফিক দান করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পরে আমি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)